

শির্ক কী ও কেন?

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. মুহাম্মদ মুযাম্মিল আলী

অধিকাংশ মুসলিমদের শির্কে পতিত হওয়ার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণ - ১

মানুষের প্রতিটি কাজের পিছনে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কোনো না কোনো কারণ থাকে। সে অনুযায়ী আমাদের দেশসহ অন্যান্য দেশের যে সব মুসলিম বিভিন্ন শির্কী বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছেন, তাদের সে সব বিশ্বাস ও কর্মের পিছনে কতিপয় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণ রয়েছে।

প্রথম পরোক্ষ কারণ : ইসলামের সঠিক আকীদা সম্পর্কে তারা অজ্ঞ

[السبب الأول غير المباشر لوقوع المسلمين في الشرك : جهالتهم عن العقيدة الإسلامية الصحيحة]

এ নিয়ে চিন্তা করলে পরোক্ষ কারণ হিসেবে যে বিষয়টিকে মৌলিকভাবে দায়ী করা যায় তা হলো : সঠিক ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও মূর্খ। ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও দ্বীনে ইব্রাহীমের অনুসারী বলে দাবীদার আরব জনপদের লোকেরাও ঠিক এ পরোক্ষ কারণেই শির্কে নিমজ্জিত হয়েছিল বলে কুরআনুল কারীম ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿يَوْمَ يَدْعُ شُرَهُمْ ۖ وَمَا يَعْزُبُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ ۖ أَضَلَّالًا ۖ تُمْتُمْ ۖ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ۖ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۚ ۱۷ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْدُبُنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ ۚ أَوَلَيْئَا وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ ۚ وَءَابَاءَهُمْ ۚ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۚ ۱۸﴾ [الفرقان: ১৭, ১৮]

“সে দিন আল্লাহ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের এবাদত করত তাদেরকে, সে দিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেন: তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? তারা বলবে- আপনি পবিত্র, আমাদের পক্ষে আপনার পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না; কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি।”[1]

এখানে “তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল”এ কথার দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত শরী‘আত সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই যুগে যুগে মানুষেরা শির্কে পতিত হয়েছিল। অতীতের মানুষেরা যেমন আল্লাহর শরী‘আত সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ শির্কী বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসে লিপ্ত হয়েছিল, কালের পরিক্রমায় অনেক মুসলিমরাও ধীরে ধীরে ইসলাম থেকে অজ্ঞ হয়ে যাওয়া বা মূল থেকেই ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা না পাওয়ার কারণে নানাবিধ শির্কী বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসে লিপ্ত হয়েছে। বর্তমানে যারা জন্ম সূত্রে মুসলিম, তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে থাকলেও মহান আল্লাহর উলূহিয়াত ও রুবূবিয়াত সম্পর্কে যে চিন্তা ও চেতনা মনে প্রাণে লালন করে মু‘মিন ও মুসলিম হতে হয়, সে সম্পর্কে তাঁদের অনেকেরই সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা নেই। তারা মুখে মুখে ‘আল্লাহ আমার রব ও উপাস্য’ এ কথা

বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিয়ে থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তারা তাদের এ স্বীকৃতি বিনষ্টকারী বহু বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসে লিপ্ত রয়েছেন। মানব জাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, নূহ আলাইহিস সালামের জাতি থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের শির্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য এ অজ্ঞতা ও মূর্খতাই হচ্ছে মূল ও প্রধানতম কারণ।

দ্বিতীয় পরোক্ষ কারণ : শয়তানের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র

মুসলিমদের শির্কে লিপ্ত হওয়ার দ্বিতীয় পরোক্ষ কারণ হচ্ছে- তাদের চিরশত্রু শয়তানের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহর সামনে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তা সে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের অজ্ঞতার সুযোগে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সে তাদেরকে এমন কিছু প্রত্যক্ষ কারণে জড়িয়ে ফেলেছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা শির্কে নিমজ্জিত হয়। নিম্নে এর কয়েকটি কারণ বর্ণিত হলো।

মুসলিমদের শির্কে নিমজ্জিত হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণসমূহ :

প্রথম কারণ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অলিগণের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন :

আল্লাহর পরে নবী, রাসূল, তাঁদে যোগ্য উত্তরসূরী আলেম ও মাশায়েখগণ হলেন সাধারণ মানুষদের প্রশংসা ও সম্মান পাবার যোগ্য। তাই তাঁদের মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনের বৈধ পন্থা হচ্ছে-কুরআন ও হাদীসে যে সকল নবী ও রাসূলগণের বর্ণনা এসেছে, তাদের নবুওত ও রেসালতের প্রতি বিশ্বাস করা। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সর্বশেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করা। নিজের আত্মা, পিতা-মাতা, সন্তানাদি, সকল মানুষ ও সম্পদের ভালবাসার উপর তাঁর ভালবাসাকে স্থান দেয়া। সব কিছুর অনুসরণ ও আনুগত্য বাদ দিয়ে নিঃশর্তভাবে কেবল তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ ও অনুকরণ করা। কর্ম জীবনে তাঁর সুন্যতের একচ্ছত্র অনুসরণ করা।[2] নবী ও রাসূলগণকে অতিমানব হিসেবে মনে না করে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, তাঁরা আমাদের মতোই মানুষ ছিলেন। তাঁদের ও আমাদের মাঝে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তাঁদের আত্মাসমূহ পবিত্র হওয়ায় মহান আল্লাহ তাঁদেরকে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের নিকট তাঁর বাণী প্রদান করেছিলেন। নবুওত ও রেসালতের দায়িত্ব আদায়ের প্রয়োজনে আল্লাহ তাঁদেরকে যতটুকু অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলেন, এর বাইরে তাঁরা নিজ থেকে আর কোনো অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারতেন না। তাঁরা তাঁদের সাধার বাইরে অপ্রাকৃতিকভাবে কারো কোনো কল্যাণ করতে বা কোনো অকল্যাণ দূর করতে পারেন না।

তাঁদের সাথে আচরণগত সম্মান :

আচরণের দিক থেকে তাঁদেরকে যে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে তা হলো তাঁদের জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পরেও তাঁদেরকে উচ্চ স্বরে নাম ধরে আহ্বান না করা। তাঁদের নাম আলোচনা করলে বা শ্রবণ করলে তাঁদের উপর সালাত ও সালাম পাঠ করা। আমাদের নবীর জন্য বিশেষ করে সাধারণ সময়ে এমনিতেই এবং আজানের পর ও সালাতের মধ্যে দরুদ ও সালাম পাঠ করা। আজানের পর তাঁর উপর দরুদ পাঠ করা এবং আল্লাহর নিকট ‘ওসীলা’ নামের একটি বিশেষ মর্যাদার স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত করার জন্য দো‘আ করা। মদীনায়া বা তাঁর মসজিদ যিয়ারতে গেলে তাঁর কবর যিয়ারত করা। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা যেমন তাঁদের নবী ও অলীদের কবরসমূহকে মসজিদ তথা গির্জায় রূপান্তরিত করেছিল তাঁদের কবরকে সেভাবে মসজিদে রূপান্তরিত না করা। মুশরিকরা যেমন কিছু সৎ মানুষের মূর্তির স্থানকে ঈদগাহ বা বার্ষিক ওরস ও মেলা বসানোর স্থানে পরিণত করেছিল তাঁদের

কবরকে সেরূপ ঈদ পালনের স্থানে পরিণত না করা। নিকট ও দূর থেকে তাঁদের নিকট কিছু না চাওয়া। অনুরূপভাবে শুধুমাত্র তাঁদের নাম বা তাঁদের মান ও মর্যাদার ওসীলায় আল্লাহর নিকট কিছু না চাওয়া। তাঁদের কবর বা তাঁদের কবরের দেয়ালে বরকত হাসিলের জন্য হাত না বুলানো। কবরের পার্শ্ব বা ভিতর থেকে মাটি বা অন্য কিছু বরকত বা ঔষধ হিসেবে ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ না করা।

ওলি ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যেহেতু নবী ও রাসূলগণের উত্তরাধিকারী, তাই তাঁরাও নবী-রাসূলগণের ন্যায় বৈধ সম্মান ও মর্যাদা পাবার অধিকার রাখেন; তবে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে, তাঁরা আর নবীগণ অবস্থানগত দিক থেকে সমান মর্যাদার অধিকারী নন। নবীদের মত তাঁরাও জীবিত বা মৃত কোনো অবস্থায়ই অদৃশ্য সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাই নবীদের মত তাঁদেরকেও দূর বা নিকট থেকে কোনো প্রকার কল্যাণার্জন বা অকল্যাণ দূরীকরণের জন্য আহ্বান না করা। মৃত্যুর পরে তাঁরাও অন্যান্য সাধারণ মৃতদের ন্যায় জীবিত মানুষদের দো‘আর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকেন। সে কারণে তাঁদের জন্য দো‘আ করা।

তাঁদের সাথে আচরণগত সম্মান হচ্ছে- তাঁদের কবর কারো বাড়ীর নিকটে হলে আল্লাহর কাছে তাঁদের মাগফিরাত কামনার জন্য মাঝে মধ্যে তা যিয়ারত করতে যাওয়া। তাঁদের কবর অপর কোনো জেলায় হলে কোনো জায়গায় উদ্দেশ্যে সেখানে গেলে তাঁদের মাগফিরাত কামনা করার জন্য তা যিয়ারত করা। তাঁদের কবর বা কবরের আঙ্গিনাকে কোনো মসজিদের ন্যায় পবিত্র ও দো‘আ কবুলের স্থান হিসেবে মনে না করা। তাঁদের নাম ও জাতের ওসীলায় আল্লাহর কাছে কিছু না চাওয়া। তাঁদের কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত না করা। তাঁদের কবরকে কেন্দ্র করে বার্ষিক ওরস পালন না করা। তাঁদের কবরে সেজদা না করা, বরকত হাসিলের জন্য কবর বা সেখানকার কোনো কিছুর উপর হাত না বুলানো এবং সেখান থেকে মাটি বা অন্য কিছু সংগ্রহ না করা। কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সেখানকার কোনো গাছের গোড়ায় সুতা না বাধা। গাছের মূল কাণ্ডে তারকাটা না লাগানো। কাগজে কিছু লিখে গাছের ডালে তা বুলিয়ে না রাখা। রোগ মুক্তির উদ্দেশ্যে সেখানকার পানির কূপ, পুকুর ও জলাশয় থেকে পানি সংগ্রহ করে না আনা।

নবী-রাসূল ও ওলীদের মর্যাদা প্রদান প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা যে, তাঁদের মর্যাদা প্রদানের উদ্দেশ্যে শরী‘আত আমাদেরকে যা করতে অনুমতি দেয়, কেবল তা করার মধ্যেই তাঁদের প্রকৃত সম্মান নিহিত রয়েছে। আর যা করতে নিষেধ করে তা করার মধ্যেই তাঁদের অসম্মান নিহিত রয়েছে। তাঁদের বা তাঁদের কবরকে কেন্দ্র করে যা করা নিষেধ তা তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁদের সম্মুখে করলে এতে যেমন তাঁরা অসন্তুষ্ট হতেন, তাঁদের মৃত্যুর পরেও তাঁদের কবরকে কেন্দ্র করে তা করলে এতে তাঁদের রূহ অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবে।

নবী-রাসূল ও সৎ লোকদের সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হলো, এটিই হচ্ছে তাঁদের সম্মান প্রদর্শনের বৈধ পন্থা। তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করার সময় যারা তা লক্ষ্য করবে তারাই তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবে এবং শির্ক ও বেদ‘আতে লিপ্ত হওয়া থেকে নিজেদেরকে নিরাপদে রাখবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর নিজ গৃহে দেওয়ার কারণ :

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা তাদের নবী ও সৎ মানুষদের কবর নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ সময়ে এদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত করে বলেছেন :

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحْذَرُوا مَا صَنَعُوا، وَلَوْ لَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا».

“ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের উপর অল্লাহর অভিসম্পাত, তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছে, তারা যা করেছে তা করা থেকে তিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:) অদূর ভবিষ্যতে তাঁর কবরকে কেন্দ্র করে এ জাতীয় কাজের ভয় না হলে তাঁর কবর ঘরের বাইরেই দেয়া হতো। তাঁর কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেয়ার ভয় হওয়ার কারণেই তিনি তাঁকে নিজ ঘরের ভিতরে দাফন করতে বলেছেন”।[3] এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তাঁর পরবর্তী উম্মতদের দ্বারা তাঁর কবরকে কেন্দ্র করে আহলে কিতাবদের অনুরূপ কর্ম করার ব্যাপারে আশঙ্কিত ছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা

وَلَوْ لَا ذَلِكَ أَبْرَزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا

এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সে আশঙ্কার কথাই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কবরকে নিয়ে যাতে কোনো রকম বাড়াবাড়ি করা না হয় সে-জন্য তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে সরাসরি নির্দেশ করে বলেছেন :

«لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا»

“তোমরা আমার কবরকে বাৎসরিক ঈদ (ওরস) বা মেলা পালনের স্থানে পরিণত করো না।”[4]

নবী বা সৎ মানুষদের কবরতো দূরের কথা তাঁদের কোনো নিদর্শন [آية] নিয়ে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করারও কোনো সুযোগ ইসলামী শরী‘আতে স্বীকৃত নয়। সে কারণেই আমরা দেখতে পাই হুদাইবিয়া নামক স্থানের যে গাছের নিচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্য তাঁর সাহাবীগণের বয়‘আত গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর একান্ত করুণায় সে গাছ ও স্থানের পরিচিতিও মুসলিমদের অন্তর থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে দিয়েছিলেন। ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : “আমরা সন্ধির শর্তানুযায়ী) পরবর্তী বছর (‘উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার পথে) হুদাইবিয়া নামক স্থানের যে গাছের নিচে আমরা বায়‘আত গ্রহণ করেছিলাম, সে গাছটি নির্ধারণের ব্যাপারে (অনেক চেষ্টা করেও) আমাদের কোনো দু’জন ব্যক্তিও তা চিহ্নিত করার ব্যাপারে একমত হতে পারে নি। এ না পারাটি ছিল আল্লাহর একান্ত রহমতস্বরূপ।”[5]

ইবনে হাজার আসকালানী বলেন: “এ গাছটি নির্ধারণ করতে না পারার মধ্যে যে হিকমত নিহিত রয়েছে তা হলো : এ গাছের নিচে যে কল্যাণের কাজ হয়েছিল সেটাকে কেন্দ্র করে যাতে ভবিষ্যতে সেখানে কোনো ফেৎনার জন্ম না হয়, সে জন্যেই এ গাছটি আল্লাহ নির্ধারণ করতে দেন নি। কারণ; যদি তা জনগণের নিকট পরিচিত থেকে যেতো, তা হলে এ গাছটি জাহিল ও অজ্ঞ লোকদের তা‘যীম ও সম্মান পাওয়া থেকে নিরাপদ থাকতো না। এমনকি জাহিলদের অজ্ঞতা তাদেরকে এ-গাছটি বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ দূরীকরণে উপকারী হওয়ার ধারণায় পৌঁছে দিতো ...।”[6] সে গাছটি তখনকার সময়ে চিহ্নিত করা সম্ভবপর না হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে খেলাফতে রাশেদার আমলেই আন্দাজ ও অনুমানের উপর নির্ভর করে লোকেরা সেখানকার একটি গাছকে কেন্দ্র করে অনেকটা বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে দিয়েছিল। নাবে‘ থেকে বর্ণিত যে, “‘উমার এর নিকট এ মর্মে সংবাদ এসে পৌঁছলো যে, কিছু লোকজন সেই গাছের নিচে যাতায়াত করে যার নিচে বায়‘আত গ্রহণ করা হয়েছিল। এ সংবাদ শুনে তিনি তা কেটে দেয়ার নির্দেশ করেন। ফলে তা কেটে ফেলা হয়।”[7] ইবন আবী শায়বাহ ও বুখারীর বর্ণনার মধ্যে বাহ্যিক কিছু বৈপরিত্য মনে হলেও আসলে দু’ বর্ণনার মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। কারণ, গাছটিতো আসলে পরবর্তী বছরই চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয় নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তীতে লোকেরা সেখানকার কোনো একটি

গাছের ব্যাপারে অনুমানের ভিত্তিতে এ ধারণা করে নিয়েছিল যে, এটিই বোধ হয় সেই গাছ, যার নিচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। এ ধারণার ভিত্তিতেই তারা সে গাছের নিচে যেতে আরম্ভ করেছিল। তবে 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সম্ভাব্য গাছটিকেও কেটে দিয়ে ভবিষ্যতে এটাকে কেন্দ্র করে যে সব বেদ'আতী ও শিকী কর্মকাণ্ড হওয়ার আশঙ্কা ছিল, সে সবার মূলোৎপাটন করেন।

মানুষকে সম্মান করা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ধরন:

সং মানুষদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ধরন ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে ড. ইব্রাহীম বরীকান বলেন : “কথা ও কাজের মাধ্যমে কারো প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এর বৈধ সীমারেখা অতিক্রম করাকেই সং মানুষদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা (الغلو في الصالحين) বলা হয়”।[৪] তিনি এ বাড়াবাড়িকে মোট দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন :

প্রথম প্রকার : কথার মাধ্যমে কারো প্রশংসা ও প্রস্তুতি বর্ণনার ক্ষেত্রে এর বৈধ সীমারেখা অতিক্রম করা। এ সীমাতিক্রমটি আবার তিন ভাবে হতে পারে :

(ক) কারো প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁকে আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাতের গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলা। যেমন এ কথা বলা যে, তিনি বিপদ দূর করতে পারেন, কল্যাণ এনে দিতে পারেন, তিনি গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত ইত্যাদি। যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কারো ব্যাপারে এ জাতীয় ধারণা পোষণ করে, তারা আল্লাহর (রুবুবিয়্যাতের) গুণাবলীতে একত্ববাদী বিশ্বাসী বলে বিবেচ্য হবে না। কারণ, এ জাতীয় ধারণা তাওহীদী বিশ্বাসের পরিপন্থী ও শির্কে আকবার এর অন্তর্গত।”[৫]

(খ) এমন সব কথা ও কাজ করা যা তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী। যেমন কারো নামে শপথ করা, কথার মাধ্যমে কারো ইচ্ছা ও কামনাকে আল্লাহর ইচ্ছার সমতুল্য করে 'আল্লাহ ও আপনি যা চান' এমনটি বলা। এ জাতীয় কথা শির্কে আকবার এর পর্যায়ে না পড়লেও শির্কে আসগার এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা আল্লাহর একত্ববাদের পূর্ণতার পরিপন্থী।

(গ) এমন কোনো গুণে কাউকে গুণান্বিত করা যা শির্ক নয়, তবে তা সে গুণান্বিত ব্যক্তির মধ্যেও নেই। যেমন কারো কৃপণ হওয়া সত্ত্বেও তাকে একজন বড় দানশীল হওয়ার গুণে গুণান্বিত করা। (যেমন কাউকে সত্যিকারের ওলি না হওয়া সত্ত্বেও তাকে 'অলিয়ে কামেল, অলিকুল শিরোমণি, পীরে কামেল, কিবলায়ে দু'জাহন ও হাদীয়ে জামান ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত করা)। মিথ্যা কথা বলা হারাম ও নিকৃষ্ট কবির গুণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে কাউকে মিছেমিছি এরূপ গুণে গুণান্বিত করাও হারাম ও কবির গুণাহের অন্তর্গত কাজ।

দ্বিতীয় প্রকার : কর্মের মাধ্যমে কারো মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা। এটি আবার চার ভাবে হতে পারে :

1. আল্লাহর উপাসনার উদ্দেশ্যে কারো কবর বা কবরে নামায পড়া, সেজদা করা, কুরআন তেলাওত ইত্যাদি করা এ ধারণার ভিত্তিতে যে, সেখানে এ সব কাজ করা উত্তম। এ জাতীয় কর্ম শির্কে আসগার এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী।
2. সং মানুষদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করার প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী (মৃত ১৯৯৯ খ্রি.) বলেন: “যে সকল মাধ্যম বিলম্বে হলেও জনগণের শির্কের মত অমার্জনীয় অপরাধে নিমজ্জিত করার কারণ হবার আশঙ্কা রয়েছে, হিকমত চায় যে, সে সকল মাধ্যমও নিষিদ্ধ করা হোক। আর সে-জন্যেই কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর-

দূরান্তে সফর করতে, কবরকে মেলার (ওরসের) স্থান বানাতে ও কবরবাসীদের নামে শপথ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এ সব কর্মই কবরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি ও কবরকে পূজা করার দিকে পৌঁছে দেয়। বিশেষ করে যখন মানুষের জ্ঞান লোপ পেয়ে অজ্ঞতা বেড়ে যায় এবং উপদেশ দানকারীদের সংখ্যা কমে যায়, তখনকার কথাতো বলা-ই বাহুল্য।”[10]

ফুটনোট

- [1]. আল-কুরআন, সূরা ফুরকান : ১৭-১৮।
- [2]. ইবনু তাইমিয়াহ, একতেদাউস সিরাতিল মুসতাকীম; সম্পাদনা : হামিদ আল-ফক্কী, (বৈরুত : দারুল মারিফাহ, সংস্করণ বিহীন, সনবিহীন), পৃ. ৩৩৬।
- [3]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জানইয়, বাব : ২২, হাদীস নং- ৪২৫; ১/১৬৮; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল মাসাজিদ..., হাদীস নং- ৫৩১; ১/৩৭৭।
- [4]. প্রথম অধ্যায়ের টীকা নং ১৬৩ দ্রষ্টব্য।
- [5]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জিহাদ, বাব: ১০৯, হাদীস নং- ২৭৯৭; ৩/১০৮০।
- [6]. ইবনে হাজার আস-কালানী, ফতহুল বারী; ৬/১১৮।
- [7]. শেখ আব্দুর রহমান ইবনে হাসান আলুস- শেখ, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৪৬। মুসনাদে ইবনে আবী শায়বাহ থেকে উদ্ধৃত।
- [8]. ড. ইব্রাহীম বরীকান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭৪, ১৭৫।
- [9]. তদেব।
- [10]. মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী, তাহযিরুস সাজিদ ‘আন ইত্তেখা-যিল কুবুরি মাসাজিদা; (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০২হিজরী), পৃ. ১৫৪, ১৫৫।